‘সাহিত্য আমার কাছে কল্পনার উড়ান’

থাকেন অক্সফোর্ডে, লেখেন ইংরেজিতে, বাঙালি। খ্যাতির এক শীর্ষ থেকে অপর শীর্ষে যাঁর অবাধ যাতায়াত, সেই বৈচিত্র্যময় ঔপন্যাসিক **কুনাল বসুর** সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অংশুমান কর**

প্রশ্ন: একজন লেখক হিসাবে আপনি কী ভাবে নিজেকে দেখবেন- একজন ‘ভারতীয় লেখক’, নাকি একজন ‘ভারতীয় ইংরেজি লেখক’, মানে ‘ইন্ডিয়ান রাইটার রাইটিং ইন ইংলিশ’? কারণ, ‘ইন্ডিয়ান রাইটার্স রাইটিং ইন ইংলিশ’ এবং ‘ইন্ডিয়ান রাইটার্স রাইটিং ইন ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গোয়েজেস’- এর মধ্যে একটা বিরোধ আছে, যা মাঝেমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বাঙালি লেখকদেরও অনেকে মনে করেন, কেবল ইংরেজিতে লিখছেন বলেই আপনারা প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করছেন। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া ঠিক কী?

উত্তর: আমি কিন্তু ইংরেজিকে অ-ভারতীয় ভাষা বলে মনে করি না। এখানে বাঙালি হওয়ারও একটা সুবিধা আছে। বাঙালিরা, অতীতে যাঁরা

> বাংলা আর ইংরেজি সাহিত্যের কোনও বিরোধ নেই। সাহিত্য এমন একটা জিনিস, যার এ ভাবে বণ্টন হয় না যে, একে আশি ভাগ দিলে ওকে কুড়ি ভাগ দিতে হবে।

লেখালেখি করেছেন, তাঁরা যেমন ইংরেজি লিখতেন, তেমন বাংলা লিখতেন। ধরা যাক, যে চিঠিটা লিখে রবীন্দ্রনাথ ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন, সেটা তো উঁচু মানের সাহিত্যকর্ম। মাইকেলের কথা ছেড়েই দিলাম। ‘সোশ্যাল থিঙ্কার’রাও অত্যন্ত ভাল ইংরেজি লেখেন, চিত্র পরিচালকেরাও। যেমন, অমর্ত্য সেন, সত্যজিৎ রায়। এঁদের বাংলা এবং ইংরেজি, দুটোই নিখুঁত। এঁদের কাছে ইংরেজিটাও নিজেদের ভাষা। তা ছাড়া, ‘ইন্ডিয়ান রাইটার্স রাইটিং ইন ইংলিশ’ আর ‘ইন্ডিয়ান রাইটার্স রাইটিং ইন ভার্নাকুলার্স’ - এ রকম একটা মোটা দাগের তফাত আমি করি না। করতে চাই না। বাংলা আর ইংরেজি সাহিত্যের কোনও বিরোধ নেই। সাহিত্য এমন একটা জিনিস, যার এ ভাবে বণ্টন হয় না যে, একে আশি ভাগ দিলে ওকে কুড়ি ভাগ দিতে হবে। এটা একটা বাজে বিতর্ক। অর্থ আর প্রচারের প্রসঙ্গে বলি, ভারতীয়দের যাঁরাই ইংরেজিতে লিখছেন, তাঁরাই অরুন্ধতী রায়ের মতো একশো হাজার পাউন্ড অ্যাডভান্স পাচ্ছেন- এটা একটা ভুল ধারণা। ইংরেজি ভাষায় প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে যত বই বেরোয়, তাদের মধ্যে ভারতীয় লেখকদের সংখ্যা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। যেমন অরুন্ধতী রায় ‘বুকার’ পাওয়ার পরে মনে হয়েছিল, প্রচুর ভারতীয় লেখকদের ইংরেজিতে লিখতে দেখা যাবে। কিন্তু এই ‘ট্রেন্ড’টা চলে যাচ্ছে। গত বছর যেমন

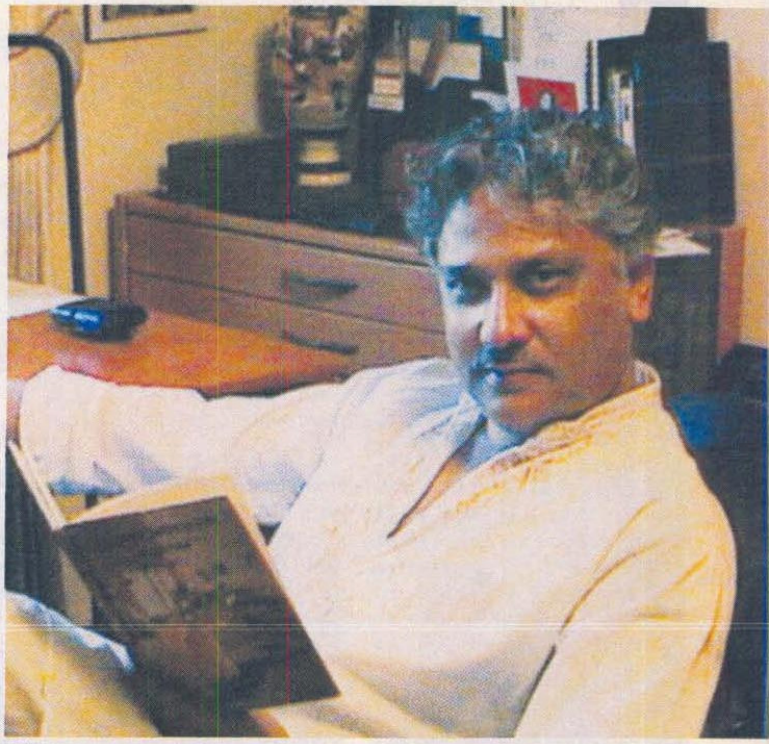

কুনাল বসু

ইংল্যান্ডে মাত্র একজন নতুন ভারতীয় লেখকের লেখা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং, ইংরেজিতে লিখছি না বলেই প্রচার পাচ্ছি না— এ রকম কোনও অভিমান বাঙালি লেখকদের মধ্যে থাকলে সেটা অর্থহীন। অর্থ ও খ্যাতির এই তর্কটা আসলে একটা নিতান্তই বাজে তর্ক। আমার কাছে সাহিত্যকর্মটাই শেষ কথা। এই তর্কের মূল্য নেই। কারণ আমার জীবন আমার ডেস্কে।

প্রশ্ন: যে তিনটে উপন্যাস আপনি এখনও পর্যন্ত লিখেছেন, তার একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও মিল নেই এবং প্রচুর গবেষণা করতে হয়েছে এই লেখাগুলো লিখতে গিয়ে। আপনার লেখাকে দেখা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে। কী পরিমাণ গবেষণা প্রয়োজন একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে?

উত্তর: আমার একটা উপন্যাস যে আর একটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তার কারণ ‘অ্যাডভেঞ্চার’। এক জন ঔপন্যাসিক হিসাবে আমি মনে করি যে, আমাকে নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কার করতে হবে। কেবল ভৌগোলিক জগৎ নয়, মানসিক বা চেতনার জগৎটাকেও আবিষ্কার করতে হবে। এটাই আমার কাছে ‘ফিকশন’ লেখার মূল

আকর্ষণ। আমি মানুষ হিসেবেও যেন নিজেকে নতুন নতুন ভাবে দেখতে পারি এক একটা উপন্যাস লিখতে গিয়ে। আসলে আমি প্রতি মুহূর্তে গল্প ভাবি। তার সবটাই যে আমি লিখি, তা কিন্তু নয়। যেমন, 'ওপিয়াম ক্লার্ক' লেখার পরে আমি কিন্তু 'মিনিয়েচারিস্ট' লেখার কথা ভাবছিলাম না। বরং অন্য একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবছিলাম, যার মুখ্য চরিত্র হবেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং সেই উপন্যাসটা লেখা হবে প্রথম পুরুষে। জ্বলন্ত বিমান থেকে একটা লোক নেমে চলে গেল এবং সেখান থেকেই গল্পটার শুরু। যখন এই লেখাটা নিয়ে ভাবছি, তখনই 'মিনিয়েচারিস্ট'-এর গল্পটা মাথায় এল। আসলে সেই গল্পই আমি লিখি, যা আমাকে লিখতেই হবে, যা আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখে। তখন আমি গবেষণা শুরু করি। তবে 'অ্যাকাডেমিক রিসার্চ'-এর সঙ্গে উপন্যাস লেখার গবেষণার আকাশ-পাতাল ফারাক আছে। উপন্যাস লেখার জন্য কোনও বিষয় আদ্যোপান্ত জানার দরকার নেই। কারণ, গল্পটা রয়েছে মাথায় এবং ততটুকুই গবেষণা প্রয়োজন, যতটুকু গল্পটাকে বার করে নিয়ে আসবে। এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে জরুরি

> সাহিত্যকর্ম আসলে আমার কাছে 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর মতো। যে স্থান-কাল-পাত্রকে আমি চিনি, তাকে নিয়ে তো 'অ্যাডভেঞ্চার' হয় না। সে দিক থেকে দেখলে 'রেসিস্টেন্স'-এর গল্পটা আমার কাছে ছিল একটা 'সুপ্রিম অ্যাডভেঞ্চার'।

হচ্ছে থামতে শেখা। এমন একটা পর্যায়, যখন ভাবা যায় যে, আমি বিষয়টা যথেষ্ট জানি, এ বার আমার কাজ লেখা। লিখতে লিখতে মনে হতে পারে, কোনও একটা বিষয় আরও একটু জেনে নিই। তখন আবার একটু পড়াশোনা করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন: আপনি 'রেসিস্টেন্স'-এর মতো একটা উপন্যাস লিখলেন কেন? আপনার আগের দুটো উপন্যাসে ভারতবর্ষ আছে, এই উপন্যাসের সঙ্গে ভারতের কোনও যোগাযোগ নেই। 'রেসিজম' নিয়ে এ রকম একটা রোমাঞ্চকর কাহিনি, একটু ঝুঁকি হয়ে গেল না কি?

উত্তর: 'রেস' ব্যাপারটা নিয়ে আমি আদৌ কখনও মাথা ঘামাইনি, কারণ আমি সমাজবিজ্ঞানী নই। পরবর্তী কালেও, মুখ্যত আমেরিকা, কানাডা বা অক্সফোর্ড-ইউনিভার্সিটি টাউনে থাকার কারণে জাতিবিদ্বেষের মারাত্মক টানাপোড়েন ব্যাপারটা দেখিনি। জাতিবিদ্বেষ নিয়ে কেন যে একটা উপন্যাস লিখলাম, সেটা আমার নিজের কাছেই একটা প্রশ্ন। যখন গল্পটা মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল, তখনও কিন্তু আমি এ-বিষয়ে তেমন কিছুই জানি না। সুতরাং গবেষণা শুরু করলাম। এটা কিন্তু কেবলমাত্র একটা নিরীক্ষার কাহিনি নয়। বরং এই বিষয়টাকে দেখা যে, কেন মানুষ যুগ যুগ ধরে ভেবেছে— এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে উৎকৃষ্ট বা অগ্রসর। এ বিষয়ে লিখতে যাওয়াটা ঝুঁকি হয়ে গেল কি না জানি না, এটুকু বলতে পারি, আমার চরিত্রই এমন যে আমি 'ক্রিয়েটিভ রিস্ক' ভালবাসি। যে গল্পটা আমার পরিচিত, যে পৃথিবীটা আমার চেনা, তার গল্প বলতে একঘেয়ে লাগে। যেমন, এন আর আই-দের জীবন আমাকে কখনওই টানে না। আমি মনে করি, অনাবাসী ভারতীয়দের জীবন খুবই একঘেয়ে, আর একঘেয়ে জীবন নিয়ে কোনও গল্প হয় না। অবশ্য সে গল্প যাঁরা লিখছেন, লিখুন। সাহিত্যকর্ম আসলে আমার কাছে 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর মতো। যে স্থান-কাল-পাত্রকে আমি চিনি, তাকে নিয়ে তো 'অ্যাডভেঞ্চার' হয় না। সে দিক থেকে দেখলে 'রেসিস্টেন্স'-এর গল্পটা আমার কাছে ছিল একটা 'সুপ্রিম অ্যাডভেঞ্চার'। আমি কখনও ভাবিনি, এই গল্পটা আমি লিখতে পারব কি না। আমি আসলে 'সেফ অথর' নই। সে হেতু আমি নিজের কাছে দাবি করি অনেক অনেক বেশি।

প্রশ্ন: 'রেসিস্টেন্স' উপন্যাসটা প্রায় রহস্য-কাহিনির ধাঁচে লেখা। আপনার আগের দুটো উপন্যাসের পাঠক ছিল মূলত 'সিরিয়াস'। কিন্তু এই উপন্যাসটা একেবারে সাধারণ পাঠকও 'ক্রাইম ফিকশন' পড়ার উত্তেজনা নিয়েই পড়বেন। সে জন্য যদি কেউ এই লেখাটাকে 'পপুলিস্ট' বলেন, আপনি মেনে নেবেন?

উত্তর: এই প্রশ্নটা আমার কাছে উপন্যাসের একটা দিক উন্মোচিত করে। ধরা যাক, ব্রেখটের নাটকের মননশীল প্রতিপাদ্য নিয়ে বোদ্ধারা এত এত বই লিখে ফেলেছেন, অথচ গ্রামের এক জন তথাকথিত 'অশিক্ষিত' লোক যখন 'তিন পয়সার পালা' দেখছেন, তিনি কিন্তু আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। একটা ঘটনার পরে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন পরের ঘটনাটার জন্য। অর্থাৎ স্রষ্টা পেরেছেন 'ন্যারেটিভ'টাকে দর্শকের কাছে নিয়ে যেতে। এই জিনিসটা আমায় খুব টানে। আমার গল্প কেবল 'প্লট-ড্রিভেন স্টোরি' নয়। তার মধ্যে সব সময় একটা দার্শনিক বিষয়বস্তু থাকে। কিন্তু ওই উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলো আমি ভীষণ ভাবে তৈরি করতে চাই। 'পপুলিজম'-এ আমার আদৌ আপত্তি নেই। অবশ্য 'পপুলিজম' বলতে যদি বোঝানো হয় মানুষকে কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য আনন্দ দেওয়া, আর কিছু নয়, তা হলে সেই 'পপুলিজম'-এ আমি বিশ্বাস করি না। কেবল 'সারফেস প্লট' আমাকে টানে না। সোপ অপেরা আমাকে টানে না। তবে দর্শনের কথা বলছি তার কারণ এই নয় যে, কোনও একটা সামাজিক যুক্তিকে 'এগজেমপ্লিফাই' করব বলে আমি উপন্যাস লিখি। আসলে আমি গল্পটাই বলতে চাই। গল্পটার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। কুৎজিও বলেছেন, "লিটারেচার হ্যাজ ইটস ওন কনশাসনেস।" এই 'কনশাসনেস' নিশ্চয়ই চার পাশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু সেটাই সব নয়। আসলে ব্যাপারটাকে একটা রূপক দিয়ে বোঝানো যাবে। সাহিত্য আমার কাছে সব সময় একটা কল্পনার উড়ান। ধরা যাক, একটা রকেট আকাশে উড়ে গেল। উড়বার জন্য সে কিন্তু পৃথিবী থেকেই রসদ নিচ্ছে। নিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে। সাহিত্যও আমার কাছে সমাজ-সভ্যতা থেকে রসদ সংগ্রহ করে অন্য গ্রহে যেতে চাওয়া। সেই গ্রহটা যে কী, আমরা জানি না। বিভিন্ন কবি-লেখক বিভিন্ন গ্রহে যেতে চাইছেন। কিন্তু এই পৃথিবীটা ছেড়ে যাচ্ছেন। এই উড়ানটাই আমার কাছে সাহিত্যের সব চেয়ে উত্তেজক অংশ।

প্রশ্ন: 'রেসিস্টেন্স'-কে পাঠক কতটা নিচ্ছেন? এই লেখাটার পাঠ-প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর: চমৎকার। আমার বইগুলোর মধ্যে এটাই সব চেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে এবং সব চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে। আসলে অ-শ্বেতাঙ্গ লোকের হাত দিয়ে এটাই প্রথম ভিক্টোরীয় উপন্যাস। যে হেতু এই লেখাটায় আমি আমার ঘরের গল্প পৃথিবীর বাজারে বলছি না, বরং অন্য দেশের ঘরের গল্প পৃথিবীর বাজারে বলছি- আমি খুবই কৌতূহলী ছিলাম এই উপন্যাসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে। আমার এজেন্ট আমাকে বলেছেন, এই লেখাটার পরে এ দেশের লোক ভাবছেন, আমি তাঁদের লেখক— আমাকে এক জন 'ইস্টার্ন কিউরিওসিটি' বলে দেখছেন না। ■